

কাজও সমাপ্ত হয়ে গেল। আল্লাহ্ সোলায়মান (আ)-এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফারসীতে দেওক উর্দুতে দীমক বলা হয়। কোরআন পাকে একে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খেয়ে ফেলল। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আ)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিনরা জানতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়েবের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়েবের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেলে এবং সব মানুষও বুঝে নিলে যে, জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে সোলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য

فَلَمَّا خُر تَبَيَّنَتْ
الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

তাই বর্ণিত হয়েছে। একে **عَذَابِ مُهِينٍ** বলে সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য সোলায়মান (আ) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজ করতে চান তাঁর ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সত্ত্বেও সোলায়মান (আ)-কে পূর্ণ এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের দ্বারা কাজ সমাপ্ত করিয়ে নেয়া হয়েছে। আরও জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকাকার মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তিও বাহ্যত গায়েবী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশংকার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরোক্ত বস্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে সোলায়মান (আ) দু'টি কারণে এই বিশেষ পস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এক. বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং দুই. মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশংকা না থাকে।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সোলায়মান (আ) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাযের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে (অন্য কোন পাখিব উদ্দেশ্য থাকবে না) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুন্দীর রেওয়াজেতে আরও আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনাতে সোলায়মান (আ) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার হাজার গরু ও বিশ হাজার ছাগল কোরবানী করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করেন। অতপর 'ছখরার' উপর দওয়ামান হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এসব দোয়া করেন—হে আল্লাহ্, আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ্! আমাকে এই নিয়ামতের শোকর আদায় করার তওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন। হিদায়তপ্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোন বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি—১. গোনাহ্‌গার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ্ মাফ করুন। ২. যে ব্যক্তি কোন ভয় ও আশংকা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশংকা থেকে মুক্তি দিন। ৩. রুগ্ন ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন। ৪. নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন। ৫. এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোন অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়।—(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সোলায়মান (আ)-এর জীবদ্দশায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, বড়বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজ বাকি ছিল। এর জন্য সোলায়মান (আ) উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর সোলায়মান (আ) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। (কুরতুবী) কতক রেওয়ামাতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, সোলায়মান (আ) অনেক পূর্বেই মারা গেছেন কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্য একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান (আ)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলায়মান (আ)-এর মোট বয়স তেপ্পান বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جِئْتِنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالِهِ كُؤُوفًا
 مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝ فَأَعْرَضُوا
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ
 خَشْبٍ وَإِثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ
 نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
 قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا أَلْيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ۝
 فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
 وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مَضْرُوقٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

(১৫) সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন—দুটি উদ্যান একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিখিক খাও এবং তাঁর প্রতি রুতজ্জতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা (১৬) অতপর তারা অবাধ্যতা করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা! আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিশ্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলরক্ষ। (১৭) এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অরুতজ্জ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (১৮) তাদের এবং

যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। (১৯) অতপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল রুতজের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সাবা অধিবাসীদের জন্য (স্বয়ং) তাদের বাসভূমিতে (অর্থাৎ বাসভূমির মোটামুটি অবস্থার মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য জরুরী হওয়ার) নিদর্শন ছিল। তন্মধ্যে এক নিদর্শন দু'সারি উদ্যান—একটি (তাদের সড়কের) ডানদিকে আর একটি বাম-দিকে (অর্থাৎ তাদের সমগ্র এলাকার দু'সারি সংলগ্ন উদ্যান বিস্তৃত ছিল। এতে উৎপাদনও ছিল প্রচুর এবং অফুরন্ত ফলমূলও ছিল। এ ছাড়া ছিল সুশীতল ছায়া ও মনোরম পরিবেশ। আমি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিলাম,) তোমাদের পালনকর্তার (প্রদত্ত) রিযিক খাও এবং (খেয়ে) তাঁর শোকর আদায় কর। (অর্থাৎ আনুগত্য কর। কারণ, দু'প্রকার নিয়ামত আনুগত্যকে অপরিহার্য করে দেয়, এক পাখিব অর্থাৎ বসবাসের জন্য স্বাস্থ্যকর শহর এবং (দুই. পারলৌকিক অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমা করার জন্য) ক্ষমাশীল পালনকর্তা। (সুতরাং এমতাবস্থায় অবশ্যই ঈমান ও আনুগত্য করা উচিত।) অতপর (এতেও) তারা (এ আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল। (সত্তবত তারা সূর্য পূজারীও ছিল, যেমন

سُورَةُ السَّابِئِ وَ قَوْمِهَا يُسْبِئُونَ وَ

সূরা নমলে তাদের কতক সম্পর্কে বলা হয়েছে : ^{١٥} لِلشَّمْسِ) ফলে আমি তাদের উপর (আমার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে)

প্রেরণ করলাম বাঁধের বন্যা। (অর্থাৎ বাঁধ দিয়ে যে বন্যা আটকিয়ে রাখা হয়েছিল, বাঁধ ভেঙ্গে সে বন্যার পানি তাদের উপর চড়াও হল। ফলে তাদের দু'সারি উদ্যান ধ্বংস হয়ে গেল।) আর তাদের দু'সারি উদ্যানকে পরিবর্তিত করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উৎপন্ন হয় বিশ্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কুল (তাও জংলী স্বউদগত, যাতে কাঁটা অনেক এবং ফল স্বাদহীন।) এটা ছিল তাদের কুফরের কারণে তাদেরকে প্রদত্ত আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে এরূপ শাস্তি দেই না। (মামুলী ভুলত্রুটি তো আমি মার্জনাই করে দেই। কুফরের চেয়ে অধিক অকৃতজ্ঞতা আর কি হবে। তারা এতেই লিপ্ত ছিল। উল্লিখিত বাসভূমি সংক্রান্ত নিয়ামত ছাড়া ভ্রমণ সংক্রান্ত আরও একটি নিয়ামত তাদেরকে দিয়েছিলাম। তা এই যে,) আমি তাদের এবং যেসব জনপদের প্রতি (ফসল ইত্যাদি ব্যাপারে) বরকত

দিয়েছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক জনপদ আবাদ করে রেখেছিলাম, যেগুলো (সড়ক থেকে) দৃশ্যমান ছিল (যাতে ভ্রমণকারীদের ভ্রমণে আতংক না হয় এবং কোথাও অবস্থান করতে চাইলে সেখানে যেতে ইতস্তত না করে,) এবং সেগুলোতে ভ্রমণের এক বিশেষ ভারসাম্য রেখেছিলাম। অর্থাৎ এক জনপদ থেকে অন্য জনপদ পর্যন্ত চলার মধ্যে এমন উপযুক্ত দূরত্ব রেখেছিলাম, যাতে ভ্রমণকালে অভ্যাস অনুযায়ী বিশ্রাম করতে পারে। যথাসময়ে কোন না কোন জনপদ পাওয়া যেত পানাহার ও বিশ্রামের জন্য। তোমরা এসব জনপদে (ইচ্ছা করলে) রাগ্নিতে এবং (ইচ্ছা করলে দিনে) নিরাপদে ভ্রমণ কর। (অর্থাৎ কাছে কাছে জনপদ থাকার কারণে রাহাজানীর উন্নয়ন ছিল না এবং সর্বত্র সবকিছু সহজলভ্য হওয়ার কারণে পানি, খাদ্য ও পাথের না পাওয়ারও আশংকা ছিল না।) অতপর (তারা এসব নিয়ামতের প্রকৃত শোকর অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করল না এবং বাহ্যিক শোকর অর্থাৎ এগুলোকে মূল্যও দিল না। সেমতে) তারা বলল : হে আমাদের পালনকর্তা, (এমন কাছে কাছে জনপদ থাকার কারণে ভ্রমণে আনন্দ নেই। পাথের ফুরিয়ে যাওয়া, পিপাসায় পানি না পাওয়া, অধীর অপেক্ষায় থাকা, চোরের ভয় থাকা এবং সশস্ত্র পাহারা দেওয়া—এসব না হলে ভ্রমণের আনন্দ কি? বনী ইসরাঈল যেমন মান্না ও সালওয়া খেতে খেতে অতিষ্ঠ হয়ে তরিতরকারি, শশা, ক্ষীরা ইত্যাদির জন্য আবেদন করেছিল, তেমনি তারাও করল। তারা আরও বলল, বর্তমান অবস্থায় ধনী-দরিদ্র সকলেই একইরূপ ভ্রমণ করে। এতে আমাদের ধনাঢ্যতা ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই। তাই মন চায় যে, আমাদের ভ্রমণের ব্যবধান (ও দূরত্ব) বর্ধিত করে দিন। (অর্থাৎ মধ্যবর্তী জনপদগুলো উৎখাত করে দিন, যাতে এক মনষিল থেকে অন্য মনষিলের দূরত্ব বেড়ে যায়। এই অকৃতজ্ঞতা ছাড়া) তারা নিজেদের প্রতি (আরও নাফরমানী করে) জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিণত করেছি এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। (তাদের কতককে ধ্বংস করে দিয়েছি। ফলে তাদের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং কতককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। অথবা স্বাচ্ছন্দ্যের দিক দিয়ে সকলেই কাহিনী হয়ে গেছে অর্থাৎ তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের আসবাবপত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। অথবা তাদের অবস্থাকে শিক্ষায় পরিণত করেছি। মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। মোটকথা, তাদের বাসভূমি, উদ্যান এবং সংলগ্ন জনপদসমূহ সবই ছারখার হয়ে গেছে।) নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ এ কাহিনীতে) প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের (মু'মিনের) জন্য বিপুল শিক্ষা রয়েছে।

অনুমানিক জাতব্য বিষয়

রিসালত ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মু'জিযা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর

আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষণ, অতপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আযাব অবতরণের আলোচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহ্ বিশেষ নিয়ামতরাজি : ইবনে কাসীর বলেন, ইয়ামানের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় নেতা। সূরা নমলে সোলানমান (আ)-এর সাথে নারী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শোকর আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কান্নেম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্ তা'আলা থেকে গাফিল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা ছারখার হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : কোরআনে উল্লিখিত 'সাবা' কোন পুরুষের নাম না নারীর, না কোন ভূ-খণ্ডের নাম? রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শামদেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইষদ, আশআরী, আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে) এবং শামদেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাস্‌সান (তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত)। এ রিওয়াকেই হাফেজ ইবনে আবদুল বারও তার "আলিকাসদু ওয়াল উমামু বেমারেফতে আস্ সাবিল আরবে ওয়াল আজম" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলিমগণের বরাতে দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা দশজন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামানে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শাম্‌স। সাবা আবদে শাম্‌স ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহতান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লিখেন, সাবা আবদে শাম্‌স তার আমলে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে সুনিয়েছিল। সত্তবত তওরাত ও ইনজীল থেকে সে এ বিষয়ে জানলাভ করেছিল অথবা জ্যোতিষী ও অতিদ্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র

শানে সে কয়েক লাইন আরবী কবিতাও বলেছিল। এ সব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম।

সাবার সন্তানদের ইয়ামানে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আঘাব আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।—(ইবনে কাসীর) কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সমন্বয়কাল হযরত ঈসা (আ)-র পরে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র পূর্বে উল্লেখ করেছেন। **فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ**

আরবী অভিধানে **عَرِم** শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তফসীরকারকগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়ে এ আয়াতের তফসীর করেছেন। কিন্তু কামুস, সেহাহ্, জওহরী ইত্যাদি অভিধানে বর্ণিত অর্থ কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এসব অভিধানে **عَرِم** এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও **عَرِم** এর অর্থ বাঁধ বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এই : ইয়ামানের রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব শহর অবস্থিত ছিল। এখানে সাবা সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহর অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দিল। পাহাড়ের বৃষ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে লাগল। বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হল যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃংখলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নিচে একটি সুবৃহৎ পুকুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফলমুলের বাগান নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরম্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কোরআন পাক **جَنَّاتٍ** অর্থাৎ দুই বাগান বলে ব্যক্ত করেছে।

কারণ, এক সারির সমস্ত বাগানকে পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কাতাদাহ্ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নারী মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত। হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।—(ইবনে কাসীর)

آللهـ كَلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهٗ بَلَدَةَ طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٍ

তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে থাক! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নামগন্ধ ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত।—(ইবনে কাসীর)

رَبِّ غَفُورٍ طَيِّبَةً—এর সাথে

মত ও ভোগ-বিলাস কেবল পাখিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শোকর আদায় করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা আছে। কারণ, এসব নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শোকর আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন ছুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

فَاعْرُضُوا نَارَنَا عَلَيْهِمْ سِوَى الْعَرَمِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার

সুবিস্থিত নিয়ামত ও পয়গম্বরগণের হ'শিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাংগা বন্যা ছেড়ে ছিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাযত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধভাংগা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অল্প ই'দুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। বৃষ্টির মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত গৃহ বিধ্বস্ত হল এবং বৃক্ষ উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ্ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাঁধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেমতে বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিখনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল লালন-পালন করল, যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুররা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল।—(ইবনে কাসীর)

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সেস্থান পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মসনদে আহমদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়ামানে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে :

وَبَدَّلْنَا لَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَجِيئٍ

—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিষাদ। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে خَمْط এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিষাদ ছিল। আবু ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটা বিশিষ্ট বৃক্ষকে خَمْط বলা হয়। أَثَل শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, أَثَل এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটা বিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

ر-এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে ময়ূ সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্পষ্ট সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশী হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদগত ও কাঁটা বিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে ر শব্দের সাথে قَلِيل যুক্ত করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদগত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا -- অর্থাৎ আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের

কারণে দিয়েছিলাম। **كفر** শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার করাও হয়ে থাকে। এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর। কেননা তারা অকৃতজ্ঞতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গম্বরকে মিথ্যারোপও করেছিল।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তা'আলা তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আ)-র পর ও রসূলুল্লাহ (সা)-র পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে **فتنة** -এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলিমের মতে এ সময়ে কোন নবী-রসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জওয়াবে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে : বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বর্তীকালে তাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল।

كفور - **وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ** শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী।

আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যক্তিত কাউকে শাস্তি দেই না। এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমান গোনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি উদ্দেশ্য নয়, বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আযাব বোঝানো হয়েছে। এরূপ আযাব বিশেষভাবে কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। মুসলমানদের উপর এরূপ আযাব আসে না।---(রূহুল মা'আনী)

এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খায়রাতের উক্তিভেদে পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

جزاء المعصية الوهن في العباداة والفيق في المعيشة والتعسر في اللذة قال لا يصادف لذة حلالا الا لاجاءه من ينغصه -

অর্থাৎ গোনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন

যে, যখন সে কোন হালাল ভোগ্যবস্তু পায়, তখন কোন-না-কোন কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উপভোগকে মলিন করে দেয়।---(ইবনে কাসীর) এতে জানা গেল যে, মুসলমান গোনাহ্‌গারের শাস্তি দুনিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোন খোলাখুলি আঘাব আসে না। এটা কাফিরদের জন্যই নির্দিষ্ট।

صدق الله العظيم لا يعاقب بمثل فعله : হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফির ব্যক্তিত্ব কাউকে দেওয়া হয় না।---(ইবনে কাসীর) মু'মিনকে তার গোনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়।

রাহুল মা'আনীত বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসাবে শাস্তি—কেবল কাফিরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গোনাহ্‌ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত স্বর্গকে আঙনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোন মু'মিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হয়।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُورَىٰ ظَاهِرَةً

وَوَدَدْنَا فِيهَا السَّبِيحَةَ এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আরও

একটি নিয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মুর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল।

الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর করতে হত। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে قُرَىٰ ظَاهِرَةً দৃশ্যমান জনপদ বলা

হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোন মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম
অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পৌঁছে নিয়মিত খাদ্য-
গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত
অন্য বস্তিতে পৌঁছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। **قَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ** বাক্যের
অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুস্বপ্ন ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নিদিষ্ট
সময়ের মধ্যে এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে পৌঁছা যেত।

سَبْرًا وَفِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا مَّيْنِينَ—এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি তৃতীয়

নিয়ামত। অর্থাৎ বস্তিসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ প্রতিক্রম করা হত।
পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ
নিশ্চিত মনে সফর করা যেত।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ

أَحَادِيثَ وَمَسَزْنَا هُمْ كُلَّ مَسَزٍ অর্থাৎ জালিমরা আল্লাহ তা'আলার

উপরোক্ত নিয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে
আমাদের পালনকর্তা, আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম
যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য
করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও
শ্রমের ব্যতিরেকেই মায়া ও সালাওয়া রিযিক হিসাবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা
আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারী
দান করুন। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে
বর্ণিত বাধাভাঙ্গা বন্যার শাস্তি দেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত
হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারী করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে
তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্বৰ্যের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত
হয়েছে।

تَمَزِينًا থেকে উদ্ভূত। অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ

মা'আরবেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন
শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে
পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলতঃ **تَفَدُّوا أَيَّامًا سَبَا** অর্থাৎ
তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বৰ্য্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদীর নাতিদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আঘাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি সব বিক্রয় করে দিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার করায়ত্ত হয়ে গেলে সে তার সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বন্যা ও আঘাব সম্পর্কে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাঁচতে চাইলে অবিলম্বে এখান থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আশ্মানে চলে যাও, যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বৃসরা নামক স্থানে গিয়ে বসবাস কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদীনায় স্থানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। তার সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইয়দ গোত্র আশ্মানে, গাসসান গোত্র বৃসরায় এবং আউস, খায়রাজ ও বনু উসমান মদীনায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। বাতনেমুর নামক স্থানে পৌঁছে বনু উসমান সেখানেই থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় খুযায়্যা। আউস ও খায়রাজ মদীনায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করল। ইবনে কাসীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, এভাবে সাবা সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা **مَرْقَاهُمْ** বাক্যে বিধৃত হয়েছে।

ان فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ مَبَّارٍ شٰكُوْرٍ

উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোন নিয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহর শোকর আদায় করে। এ ভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই উপকার লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে আদেশই জারী করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোন নিয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরূপ পুরস্কার ও সওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তার জন্য উপকারী হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ **صَبَّارٍ** শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী মু'মিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ الْإِفْرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ
 هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝

(২০) আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। (২১) তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার পালন-কর্তা সববিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বাস্তবিক তাদের (অর্থাৎ মানবজাতি) সম্পর্কে ইবলীস তার ধারণা সত্যে পরিণত করল (অর্থাৎ তার বিশ্বাস ছিল যে, সে অধিকাংশ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে, কেননা তারা মাটির তৈরি এবং সে আগুনের তৈরি। তার এ বিশ্বাস যথার্থ প্রমাণিত হল।) ফলে সবাই তার অনুসরণ করল মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত। (তাদের মধ্যে যারা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন ছিল, তারা সম্পূর্ণই নিরাপদ রইল) এবং যারা দুর্বল মু'মিন ছিল, তারা গোনাহে লিপ্ত হলেও শিরক ও কুফর থেকে বেঁচে রইল। তাদের উপর ইবলীসের কোন ক্ষমতা ছিল না; তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে সন্দেহ পোষণ করে, তা (বাহ্যত) জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য (অর্থাৎ মু'মিন ও কাফিরকে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল। যাতে ন্যায়-বিচারের স্বার্থে সওয়াব ও আযাব দেওয়া যায়)। আপনার পালনকর্তা (যেহেতু) সববিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক (যাতে ঈমান এবং কুফরও অন্তর্ভুক্ত তাই তিনি প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন)।

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَبْلُغُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
 السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ ۖ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ
 ظَهِيرٍ ۝ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن
 قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ قُلْ

مَنْ يَزُرْكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ أِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ

أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا

تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَعُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَ الْفَتَّاحُ

الْعَلِيمُ ۞ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّم بِهِ شُرَكَاءِ كَلَّا ۖ بَلْ هُوَ اللَّهُ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞

(২২) বলুন, তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। (২৩) যার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরে বলবে, তিনি সত্য বলেছেন এবং তিনিই সবার উপরে মহান। (২৪) বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রিষিক দেয়। বলুন, আল্লাহ্। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ? (২৫) বলুন, আমাদের অপরাধের জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যাকিছু কর, সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হব না। (২৬) বলুন, আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে সমবেত করবেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। (২৭) বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ, তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও। বরং তিনিই আল্লাহ্, পরাক্রমশীল, প্রজাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে নিজেদের অভাব-অনটনে) ডাক (এতে তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা জানা যাবে। তাদের বাস্তব অবস্থা এই যে,) তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে না, এতে (অর্থাৎ এতদূভয়ের সৃষ্টি কর্মে) তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের কেউ (কোন কাজে) আল্লাহর সহায়ক নয়। আল্লাহর সামনে (কারও) সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই হতে পারে না) কিন্তু তার জন্য যার সম্পর্কে তিনি (কোন সুপারিশকারীকে) অনুমতি দেন। (কাফির ও মুশরিকদের কিছুসংখ্যক মুর্থ স্বহস্ত নিমিত পাথরের বিগ্রহকেই অভাব পূরণকারী

কার্যনিবাহী ও আল্লাহর অংশীদার মনে করত। তাদের খণ্ডন করার জন্য আয়াতের প্রথম বাক্য **لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ** বলা হয়েছে।

কিছু মুর্থ মূর্তিকে এত ক্ষমতাবান মনে করত না, কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, মূর্তিগুলো আল্লাহর কাজে সহায়ক। তাদের খণ্ডন করার জন্য **مَا لَكُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ**

বলা হয়েছে। কিছুসংখ্যক এরূপও মনে করত না; কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মূর্তিগুলো আল্লাহর প্রিয় বটে। এরা যার সুপারিশ করবে, তার মনোবাচ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। সেমতে তারা বলত: **إِنَّهُمْ لَشَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ** তাদের খণ্ডনের জন্য

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন।

এরা আল্লাহর প্রিয় নয়। অতপর বলা হয়েছে যারা যোগ্য ও আল্লাহর প্রিয় যেমন ফেরেশতা, তারা পর্যন্ত কারও সুপারিশ করার ব্যাপারে স্বাধীন নয়; তাদের সুপারিশ করার রীতি এই যে যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয় তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে; তাও সহজে নয়। কেননা, তারা নিজেই আল্লাহর ভয়ে হিমসিম খেতে থাকে। তাদেরকে কোন আদেশ দেওয়া হলে অথবা কারও জন্য সুপারিশ করতে বলা হলে তারা আদেশ শোনার সময় ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অতপর ভয়ের অবস্থা দূর হয়ে গেলে আদেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেয় যে কি আদেশ হয়েছে। এরপর তারা আদেশ পালনে রত হয় এবং কারও জন্য সুপারিশ করে।

সারকথা, আল্লাহর যোগ্য ও প্রিয় ফেরেশতাগণও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিনামূলিতে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না। সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হলেও ভয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। এরপর সংজ্ঞা ফিরে এলে সুপারিশ করে। এমতাবস্থায় স্বহস্ত নিমিত পাথুরে মূর্তি—যাদের না আছে যোগ্যতা এবং না তারা আল্লাহর প্রিয়—তারা কেমন করে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে? পরবর্তী আয়াতে ফেরেশতাগণের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার বিষয় এভাবে বিবৃত হয়েছে: যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি (বা আদেশ শোনার সময় দেখা দেয়,) দূর হয়ে যায়, তখন পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তোমাদের পালনকর্তা কি আদেশ করেছেন? তারা বলে, (অমুক) সত্য আদেশ দিয়েছেন। (যেমন ছাত্র পড়ার সময় শিক্ষকের বক্তৃতা বিগুচ্ছভাবে গুচ্ছ করার জন্য পরস্পরে পুনরাবৃত্তি করে নেয়, ফেরেশতাগণও তদ্রূপ আদেশ সম্পর্কে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয়, অতপর আদেশ পালন করে। আল্লাহর সামনে ফেরেশতাগণের এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কেননা) তিনি সবার উপরে, সুমহান।

আপনি (তাদেরকে তওহীদ প্রমাণ করার জন্য আরও) বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে (রশ্মি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) রিষিক দান করে ? (এর জওয়াব তাদের কাছেও নির্দিষ্ট ; তাই) আপনি (-ই) বলে দিন, আল্লাহ্ (রিষিক দেন, আরও বলুন, এই তওহীদের বিষয়ে) নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা প্রকাশ্য বিদ্রান্তিতে আছি ও আছ (অর্থাৎ এটা সম্ভবপর নয় যে, তওহীদ ও শিরক পরস্পর বিরোধী দুটি-ই শুদ্ধ ও সত্য হবে এবং উভয় প্রকার বিশ্বাস পোষণকারীই সত্যধর্মী হবে ; বরং এতদুভয়ের মধ্যে একটি সঠিক ও অপরটি অসঠিক হওয়া জরুরী । যারা শুদ্ধ বিশ্বাসী, তারা সৎপথে এবং যারা ভ্রান্ত বিশ্বাসী, তারা পথভ্রষ্টতায় থাকবে । এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ, এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিশ্বাস সত্য এবং কে সত্য ও সত্যপন্থী এবং কে পথভ্রষ্ট ।) আপনি (তাদেরকে এই বিতর্কে আরও) বলে দিন, (আমি সত্য ও মিথ্যা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি, এখন তোমরা ও আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী) তোমরা আমাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না এবং আমরা তোমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব না । আপনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন, (এক সময় অবশ্যই আসবে, যখন) আমাদের পালনকর্তা সকলকে (এক স্থানে) সমবেত করবেন, অতপর আমাদের মধ্যে সঠিভাবে ফয়সালা করবেন । তিনি ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ । আপনি (আরও) বলুন, (তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও সর্বময় ক্ষমতার কথা শুনলে এবং তোমাদের মূর্তিগুলোর অসহায়ত্ব দেখলে) আমাদের একটু তাদেরকে দেখাও, যাদেরকে তোমরা শরীক স্থির করে (ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে) আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে রেখেছ । (তাঁর কোন শরীক নেই ;) বরং (বাস্তবে) তিনিই আল্লাহ্ (অর্থাৎ সত্য উপাস্য) পরাক্রমশালী, প্রজাময় ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজাহীন হয়ে যায়, অতপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে । সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবু হোরায়রার উদ্ধৃত রেওয়াজে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে কোন আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে (এবং সংজাহীনের মত হয়ে যায় ।) অতপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও জয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন ? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারী করেছেন ।

মুসলিম উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যখন কোন আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তসবীহ পাঠ করতে থাকে । তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ পাঠ করে । অতপর তাদের তসবীহ শুনে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতাগণ তসবীহ পাঠ করে । এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন

আকাশের ফেরেশতাগণও তসবীহ পাঠে রত হয়ে যায়। অতপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌঁছে যায়।—(মাযহারী)

বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা : **وَإِنَّا أَوْأَيُّكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** —এতে মুশরিক

ও কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মুর্থ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞানোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিতর্ককারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফির বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন সমঝদার ব্যক্তি তওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদ-পন্থী ও শিরকপন্থী উভয়কে সত্যপন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্য পথে ও অপর দল ভ্রান্ত পথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফির ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোর প্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়।—(কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন)

আলিমগণের উচিত এই পন্থগম্বরসুলভ দাওয়াত, উপদেশ ও বিতর্কের পন্থাটি সদাসর্বদা সামনে রাখা। এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও বিতর্ক নিষ্ফল বরং ক্ষতিকর হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ জেদের বশবর্তী হয়ে যায় এবং তাদের পথভ্রষ্টতা আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ

(২৮) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (অর্থাৎ জিন, ইনসান, আরব, আজম উপস্থিত কিংবা ভবিষ্যতে আগমনকারী সবার জন্য) পয়গম্বর করে (বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে আমার সম্ভৃষ্টি ও সওয়াবের) সুসংবাদদাতারূপে এবং (বিশ্বাস স্থাপন না করলে তাদেরকে আমার ক্রোধ ও আযাবের ব্যাপারে) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না (মুর্থতা ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার ও মিথ্যারূপে মেতে উঠে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের এবং আল্লাহ্ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূলে করীম (সা) বিশ্বের সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

كَافَّةً لِّلنَّاسِ শব্দটি আরবী বাক্যপদ্ধতিতে সবকিছুকে शामिल

করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্য প্রকরণে শব্দটি বিধায় كَافَّةً لِّلنَّاسِ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূর্বে প্রেরিত পয়গম্বরগণের রিসালত ও নবুয়ত বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল। এটা শেষ নবী (সা)-রই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক। কেবল মানবজাতিই নয়, জিনদেরও তিনি রসূল। তাঁর রিসালত শুধু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলীল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শরীয়ত ও স্বীয় কিতাব কোরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফায়ত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোন নবী প্রেরণের আবশ্যিকতা নেই।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবেরের রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরকে দান করা হয়নি। এক--আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ভক্তিব্রহ্ম ভয়দান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিব্রহ্ম

ভয় আম্বল করে রাখে। দুই—আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। (পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে ইবাদত নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা উপাসনালয়েই হত; ইবাদতগাহের বাইরে মসজিদে অথবা গৃহে ইবাদত হত না। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামায আদায় করতে পারবে। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা ওয়ূর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।) তিন—আমার জন্য মুক্কাবন্দ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন উম্মতের জন্য এরূপ সম্পদ হালাল ছিল না। (তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফিরদের যে সম্পদ হস্তগত হবে, তা একত্রিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দেবে। সেখানে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মুক্কাবন্দ সম্পদ কোরআন বর্ণিত নীতি অনুযায়ী বণ্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয করা হয়েছে।) চার—আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোন পয়গম্বর সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে)। পাঁচ—আমার পূর্বে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ
 يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ
 مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ
 الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أَنْحُنُ صَدَقْتُمْ عَنِ
 الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ
 اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُؤُنَا الَّذِي لِيَوْمِ النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ

تَكْفُرُ بِاللهِ وَنَجَعَلْ لَكَ اَنْدَادًا ۚ وَ اَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُوا الْعَذَابَ ۗ
 وَجَعَلْنَا الْاَعْلَلَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا
 كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧٠﴾

(২৯) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে? (৩০) বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। (৩১) কাফিররা বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। আপনি যদি পাগিষ্ঠদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হল, তারা অহংকারীদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। (৩২) অহংকারীরা দুর্বলকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়ত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরোধী। (৩৩) দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি। তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বস্তুত আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কিয়ামত সম্পর্কে يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَرَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ الْحِجَابَ)
 বলে (বল,) এ ওয়াদা কবে (বাস্তবায়িত) হবে যদি তোমরা (অর্থাৎ নবী ও তাঁর অনুসারীগণ) সত্যবাদী হও। আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিবসের ওয়াদা (নির্ধারিত) রয়েছে, যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে সঠিক সময় বলা না হলেও তাঁর আগমন নিশ্চিত। তোমাদের জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য তো অস্বীকার করা।) কাফিররা (দুনিয়াতে তো খুব কথার বাহাদুরী দেখায় এবং) বলে, আমরা কখনও এ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। (কিয়ামতের দিন এসব বাগাড়ম্বর খতম হয়ে যাবে। সেমতে) আপনি যদি তাদের (তখনকার অবস্থা) দেখতেন, (তবে এক ভয়ানক দৃশ্যই দেখতে পেতেন,) যখন পাগিষ্ঠদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে। তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। (কোন কাজ নষ্ট হয়ে গেলে স্বভাবত যেমনটি করা হয়। সেমতে)

নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (অর্থাৎ অনুসারীরা) বড়দেরকে (অর্থাৎ অনুসৃতদেরকে) বলবে, আমরা তো তোমাদের কারণেই বরবাদ হয়েছি। তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। (তখন) বড়রা নীচদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হিদায়তে আসার পর (তা পালন করতে) আমরা কি তোমাদেরকে (জবরদস্তি) নিবৃত্ত করে-ছিলাম ? বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী—(সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও) তোমরা তা কবুল করনি ; এখন আমাদেরকে দোষারোপ করছ। (এর জওয়াবে) নীচরা বড়দেরকে বলবে, তোমরা জবরদস্তি করেছিলে, আমরা একথা বলিনি) বরং তোমাদের দিবা-রাত্রির চক্রান্ত আমাদেরকে বাধা দান করেছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি (চক্রান্তের অর্থ উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ দিবারাত্রির এসব শিক্ষা চক্রান্তের ফলেই আমরা বরবাদ হয়েছি। কাজেই তোমরা আমাদেরকে ধ্বংস করেছ।) এবং (এ কথাবার্তায় একে অপরকে দোষারোপ করলেও মনে মনে নিজের দোষও বুঝবে। গোমরাহকারীরাও তাদের তৎপরতা অন্তরে স্বীকার করবে এবং পথভ্রষ্টরাও চিন্তা করবে যে, বেশি দোষ তাদেরই। তারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝল না কেন ? কিন্তু) তারা তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে (অপরের কাছে প্রকাশ করবে না) যখন নিজ নিজ কর্মের শাস্তি (হতে) দেখবে (যাতে নিজেদের ক্ষতির সাথে সাথে অপরেও না হাসে। কিন্তু পরিশেষে কঠোর আযাবের কারণে এ ধৈর্য অবশিষ্ট থাকবে না)। এবং (সবাইকে অভিন্ন শাস্তি দেওয়া হবে যে,) আমি কাফিরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেব (এবং শিকল দিয়ে আঙুটপৃষ্ঠে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব)। তারা যা করত, তারই প্রতিফল পাবে।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
 كَفَرُونَ ۝ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝ قُلْ
 إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ
 وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُوفِ
 آمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ
 مُخْضَرُونَ ۝

(৩৪) কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না। (৩৫) তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সুতরাং আমরা শাস্তিপ্ৰাপ্ত হব না। (৩৬) বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়, তাদেরকে আঘাতে উপস্থিত করা হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (হে পয়গম্বর, আপনি তাদের মূর্খজনোচিত কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হবেন না। কেননা, এ আচরণ আপনার সাথেই নতুন নয়, বরং) কোন জনপদেই আমি এমন কোন ভীতি প্রদর্শনকারী (পয়গম্বর) প্রেরণ করিনি, যেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা (সমকালীন কাফিরদের ন্যায়) একথা বলতে শুরু করেছে যে, যেসব বিধানসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা সেগুলো মানি না। তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (সূরা কাহফে বলা হয়েছে: **أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا**)

وَأَعَزُّ نَفَرًا—কাজেই আমরা যে আল্লাহর প্রিয় ও সম্মানিত, এটাই তার দলীল।) আমরা কখনও শাস্তিপ্ৰাপ্ত হব না। (মক্কার কাফিররাও তাই বলে। আল্লাহ বলেন:

—قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا

সুতরাং দুঃখিত হবেন না। তবে তাদের উক্তি খণ্ডন করুন এবং এভাবে) বলুন, (রিযিকের আধিক্য আল্লাহর প্রিয় হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এটা নিছক আল্লাহর ইচ্ছা। সেমতে) আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন (এতে অনেক রহস্য থাকে)। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না (যে, এটা অন্যান্য কারণের উপর নির্ভরশীল—আল্লাহর প্রিয় হওয়ার উপর নয়। হে কাফির সম্প্রদায়, আরও শুন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলীল নয় তেমনি) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে মর্ষাদান ক্ষেত্রে আমার নিকটবর্তী করবে না, অর্থাৎ (এগুলো নৈকট্যের কার্যকর কারণ নয়। সুতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন নৈকট্যের উপায় নয়, তেমনি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভিত্তিতেও নৈকট্য লাভ হয় না।) তবে যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে (এ দু'টি বিষয় অবশ্যই নৈকট্যের

কারণ)। সুতরাং এমন লোকদের জন্য তোমাদের সৎকর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। (অর্থাৎ কর্মের তুলনায় তা বেশি—দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। আল্লাহ্ বলেন :
 مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثْلِهَا) এবং তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে (আসীন) থাকবে। আর যারা (তাদের বিপরীতে কেবল ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি নিয়ে গর্ব করে এবং ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করে না বরং তারা) আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় (নবীকে) পরাভূত করার জন্য, তাদেরকে আযাবে নিষ্ক্লিপ্ত করা হবে।

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

পাখিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা ধোঁকা : পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধিতা এবং পয়গম্বর ও সৎ লোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থীদের মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কোরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধরনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু'ব্যক্তি এক শরীকী ব্যবসা করত। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করে কোন সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় চলে যায়। যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হলেন এবং তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে জানা-জানি হল, তখন উপকূলবর্তী সঙ্গী মস্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবুয়ত দাবির ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। জওয়াবে মস্কার সঙ্গী লিখল, কুরাইশ গোত্রের কেউ তাঁর অনুসরণ করে না। কেবল নিঃস্ব, দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকজনই তার সাথে রয়েছে। উপকূলবর্তী সঙ্গী তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মস্কার আগমন করল এবং সঙ্গীকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে তওরাত, ইনজীল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? রসূলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিবৃত করলেন। তাঁর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা মাত্রই আগম্বক বলে উঠল : **أشهد أنك رسول الله** (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চিতই আল্লাহ্‌র রসূল)। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে পারলে? সে জ্ঞান করল, (জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে আপনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর লক্ষণ এই দেখেছি

যে) পূর্বে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, গুরুতে তাঁদের সকলের অনুসারী দরিদ্র, নিঃশ্ব ও নিম্নস্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য **مَا أَرْسَلْنَا** **فِي تَرْيَةِ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا** আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর,

মাহারী) **تَرْفٌ** শব্দটি **مُتْرَفٌ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। **مُتْرَفِينَ** বলে বিত্তশালী ও সরদারকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোন রসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মুকাবিলা করেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে :

ذُنُوبُنَا أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ—অর্থাৎ আমরা

ধনেজনে সব দিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আঘাবে পতিত হব না। (বাহ্যত তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য কেন দিতেন?) তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে তাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে :

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَسَخَّرَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ رِجَالًا وَمَالًا وَأَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ এবং **مَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ الْآيَةُ**

يَشَاءُ وَيُقَدِّرُ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়, বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনি ই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মুর্থতা। আল্লাহ্‌র প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে

আছে : **أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُهَدُّهُمْ مِّنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي**

الْآخِرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ—অর্থাৎ তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও

সন্তানসন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকাল-
জের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক! (কখনই নয়।) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে
বেখবর। (অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফিল
করে দেয়, তা তার জন্য শাস্তিস্বরূপ)

অন্য এক আয়াতে আছে : **فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا**

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

অর্থাৎ কাফিরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে।
কেননা আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির
মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফির অবস্থায়ই বের
হয়ে যাবে, যার ফল হবে পরকালের চিরস্থায়ী আযাব। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির
মাধ্যমে দুনিয়াতে আযাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তান-
সন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ্ ও
পরকালের প্রতি দ্রুক্ষেপও করে না, যার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী আযাব। অনেক
ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই
মাধ্যমে হাজারো বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শাস্তি ও আযাব তো
এ জগৎ থেকেই শুরু হয়ে যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্
তা'আলা তোমাদের রূপ ও ধনসম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম
দেখেন। (আহমাদ, ইবনে কাসীর)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ

এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহ্র প্রিয়জন।
দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।
ضُفُف অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে
বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা
পরকালে মু'মিন ও সৎকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতি-
দান তার দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে
এক কর্মের প্রতিদান সাত শ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত
রয়েছে বরং তার বেশিও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের

জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে غرْفَةٌ বলে। এরই বহুবচন غرَفَاتُ—(মাযহারী)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْتَ بِمُعْتَدِلٍ
مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ①

(৩৯) বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিযিক দাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (মু'মিনগণকে) বলে দিন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অগাধ রিযিক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত রিযিক দেন। (ব্যয়ে রূপগতা করলে রিযিক বাড়তে পারে না এবং শরীয়ত অনুযায়ী ব্যয় করলে হ্রাস পেতে পারে না। তাই তোমরা ধনসম্পদকে মহব্বত করো না; বরং আল্লাহ্ হক, পরিবার পরিজনের হক, ফকির-মিসকীন ইত্যাদি যে যে খাতে ব্যয় করার নির্দেশ রয়েছে তাতে অকাতরে ব্যয় করতে থাক। এতে বন্টনকৃত ও অবধারিত রিযিকে কোন ক্ষতি দেখা দেবে না এবং পরকালে উপকার পাওয়া যাবে। কেননা) তোমরা (আল্লাহ্ নির্ধারিত খাতে) যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ্ (পরকালে অবশ্যই এবং দুনিয়াতেও) এর প্রতিদান দেবেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দই পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যত এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা এই

যে, এখানে لَ ʾ অতি-
يَقْدِرُ ʾ এবং مِنْ عِبَادٍ ʾ শব্দের পরে
مِّنْ يُّشَاءُ ʾ শব্দের পরে

রিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। مِنْ عِبَادٍ ʾ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ

বান্দা অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনগণ যেন ধনসম্পদের মহব্বতে এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ্ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফির ও মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পাখিব ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং

এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলীল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি হয়নি। তফসীলের সার-সংক্ষেপে 'মুমিন-গণকে' শব্দ যোগ করে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিযিক বন্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য ও পাখিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিযিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি কখনও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিজুতার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে **يُقَدَّر** শব্দের পরে বর্ণিত **لِ** সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে তারাই বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়। মানুষ ও জীবজন্তু অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে। এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ভূগর্ভে কৃপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা যতই ব্যয় করা হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহ্যত খাদ্য-খাবার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তৎস্থলে অন্য খাদ্য সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মোট কথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে অন্য বস্তুকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোন কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহর নীতির পরিপন্থী নয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হোরাযরা বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, প্রত্যহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে **اللَّهُمَّ اعط منفقًا خلفًا و اعط ممسكًا خلفًا** — অর্থাৎ হে আল্লাহ, যে ব্যয় করে, তাকে তার বিনিময় দান কর এবং যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট কর। অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন : আপনি মানুষের জন্য ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব।

যে ব্যয় শরীয়তসম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই : হযরত জাবেরের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ্ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবেরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা।—(কুরতুবী)

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদনও হ্রাস পায় : এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো যবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মাম্বত ইত্যাদিতে যবেহ করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ্ তা'আলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নিচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত। কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু-ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দুটি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই যবেহ করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর-বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা যবেহ না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে সওয়াবী ও মালপত্র পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কোরবানীর মুকাবিলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে, বিশ্বমীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْوَلَاءِ أَيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونِهِمْ ء بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ء

الْكَثْرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ۝

(৪০) যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ? (৪১) ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী। (৪২) অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি জালিমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আশ্বাদন কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সেদিনটি স্মরণীয়) যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে (কিয়ামতের ময়দানে) সমবেত করবেন এবং ফেরেশতাগণকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ? [মুশরিকদেরকে জব্দ করার জন্য ফেরেশতাগণকে এই প্রশ্ন করা হবে। তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে ফেরেশতা ও অন্যদের পূজা করত যে, তারা সম্ভুট হয়ে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। অন্য এক আয়াতে এ ধরনের প্রশ্ন হয়রত ইসা (আ)-কে **أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ** বলে করা হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, তারা কি তোমাদের সম্ভুটিক্রমে তোমাদের পূজা করত ? তাছাড়া এর জওয়াব থেকেও এটা জানা যায়।] ফেরেশতারা (প্রথমে আল্লাহ যে শরীকের উর্ধ্বে ও পবিত্র, একথা প্রকাশ করার জন্য) আন্বয় করবে, আপনি (শরীক থেকেও) পবিত্র (শরীক হওয়ার যে সম্পর্ক তাদের সাথে করা হয়েছে, তাতে ভীত হয়ে জওয়াবে পূর্বে তারা এ বাক্য উচ্চারণ করবে, অতপর প্রশ্নের জওয়াব দেবে যে,) আমাদের সম্পর্ক (কেবল) আপনার সাথে, তাদের সাথে নয়। (এতে সম্ভুটি ও আদেশ উভয়টিই অবর্তমান বলে বোঝা গেল। অর্থাৎ আমরা তাদেরকে পূজা করারও আদেশ দেইনি এবং তাদের একাজে সম্ভুটও নই। বরং আমরা আপনারই অনুগত। আপনি যা অপছন্দ করেন, যেমন শিরক ইত্যাদি, আমরাও তা অপছন্দ করি। এতে যেমন আমাদের আদেশ ও সম্ভুটি কিছুই নেই, যেমন বাস্তবে) তারা (আমাদের পূজা করত না;) বরং শয়তানদের পূজা করত। (কেননা শয়তান তাদেরকে এ কাজে উৎসাহ দিত এবং এতে সম্ভুট থাকত। সুতরাং তারাই তাদের উপাস্য। কেননা, আনুগত্য ছাড়া ইবাদত হয় না এবং ইবাদত ছাড়া আনুগত্য হয় না। সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে যখন আদেশ ও সম্ভুটি কিছুই হয়নি, তখন আমাদের আনুগত্য হয়নি। শয়তানদের যখন আনুগত্য

হয়েছে তখন ইবাদতও তাদেরই হয়েছে। তারা একে ফেরেশতাদের ইবাদত বলুক অথবা প্রতিমাদের ইবাদত বলুক, আসলে তা শয়তানেরই ইবাদত। এতে যেমন তাদের শয়তানের ইবাদতকারী হওয়া জরুরী হয়েছে, তেমনি তাদের অধিকাংশই (জরুরী হওয়া হিসেবেও) শয়তানের ভক্ত ছিল। (অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বকও অনেকে শয়তানের পূজা করত। সূরা জিনের আয়াতে আছে—

وَإِنَّكَ كَانِ رِجَالٍ مِّنَ الْأَنْسِ يَعُوذُونَ
(অতএব (কাফিরদেরকে বলা হবে, যাদের তরফ থেকে

তোমরা আশাবাদী ছিলে) অদ্য (স্বয়ং তাদের সম্পর্কহীনতা দ্বারাও এবং তাদের অক্ষমতা দ্বারাও তোমাদের ধারণার বিপরীতে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, উপাস্যরা তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না, কিন্তু এতে উভয়ের অবস্থা যে সমান, একথা প্রমাণ করার জন্য

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যেমন অক্ষম, তেমনি তারাও অক্ষম। অক্ষমতার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য অপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাক্যটি আরও জোরদার হয়ে গেছে।) আর (তখন) আমি জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) বলব, জাহান্নামের স্নেহ শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে, (এখন) তা আশ্বাদন কর।

وَإِذَا تَتَلَوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ

عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفَاكٌ مُّفْتَرَىٰ وَقَالَ

الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ إِنَّ هَذَا إِلَّا سَعْرٌ مِّمَّيْنِ ۖ وَمَا

آتَيْنَهُمْ مِّنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ۗ

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَلَذَّبُوا رُسُلِي ۗ

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِي

وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۖ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ

بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۗ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ۖ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِن

أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٧﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ
 بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٥٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ﴿٥٩﴾
 قُلْ إِنْ ضَلَّكُ فَمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ
 إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٦٠﴾

(৪৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপদাদারা যার ইবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাফিরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট ঘাদু। (৪৪) আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিনি। (৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। এরপরও তারা আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি! (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি: তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু'দুজন করে দাঁড়াও, অতপর চিন্তাভাবনা কর— তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র। (৪৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। (৪৮) বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলিমুল গায়েব। (৪৯) বলুন, সত্যধর্ম আগমন করেছে এবং মিথ্যা ধর্ম নিঃশেষিত হয়ে গেছে। (৫০) বলুন, আমি পথদ্রষ্ট হলে নিজের ক্ষতির জন্যই পথদ্রষ্ট হব; আর যদি আমি সৎপথপ্রাপ্ত হই, তবে তা এ জন্য যে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বপ্রোতা, নিকটবর্তী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট (সত্য ও হিদায়তকারী) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা [তিলাওয়াতকারী রসূল (সা) সম্পর্কে] বলে, (নাউ-যুবিল্লাহ্,) এ ব্যক্তি তো তোমাদের বাপদাদারা (প্রাচীনকাল থেকে) যার ইবাদত করত, তা (অর্থাৎ তার ইবাদত) থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। (এবং বাধা দিয়ে নিজের অনুসারী করতে চায়। একথা বলে হতভাগাদের উদ্দেশে একথা

বোঝানো যে, তিনি নবী নন এবং তাঁর দাওয়াতও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়; বরং এতে নেতৃত্ব লাভের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত।) তারা (কোরআন সম্পর্কে) আরও বলে, (নাউযুবিল্লাহ্,) এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে এর সম্পর্ক মনগড়া।) আর কাফিরদের কাছে সত্য (অর্থাৎ কোরআন) আগমন করার পর তারা (এই প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য যে, কোরআন মনগড়া মিথ্যা হলে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এর অনুসরণ করে কেন এবং এর এত প্রভাবই বা কেন?) বলে, এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু। (এটি শুনে মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। কোরআন ও নবীর প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল। কারণ, তাদের জন্য উভয়টিই অপ্ৰত্যাশিত নিয়ামত ছিল এ কারণে যে,) আমি (কোরআনের পূর্বে) তাদেরকে (কখনও) কোন (ঐশী) কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে। (যেমন, বনী ইসরাঈলের কাছে ঐশী গ্রন্থ ছিল। সুতরাং তাদের জন্য তো কোরআন ছিল এক অভিনব বস্তু। তাই এর সম্মান করা কর্তব্য ছিল।) এবং (এমনিভাবে) আপনার পূর্বে আমি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (পয়গম্বর) প্রেরণ করিনি। (সুতরাং তাদের জন্য পয়গম্বরও ছিল এক নতুন রত্ন। তাই তাঁরও সম্মান করা কর্তব্য ছিল। অথচ ইতিপূর্বে তাদের বাসনাও এই ছিল যে, কোন নবী আগমন করলে তারা তাঁর অনুসরণ করবে। এক আয়াতে আছে :

وَ اَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ اٰهْدٰى

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সম্মান করেনি। আল্লাহ্ বলেন,

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نِفُوْرًا

বরং তারা মিথ্যারোপ করেছে। তারা

যেন মিথ্যারোপ করে নিশ্চিত না হয়ে যায়। কেননা মিথ্যারোপের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। সেমতে) তাদের পূর্ববর্তী কাফিররাও (পয়গম্বর ও ওহীর প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। আমি তাদেরকে যে সাজসরজাম দিয়েছিলাম, তারা (অর্থাৎ আরবের মুশরিকরা) তো তার এক দশমাংশও পায়নি। (অর্থাৎ তাদের মত শক্তি, বয়স ও ঐশ্বর্য আরবের মুশরিকরা পায়নি, যা অহংকারের কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্

বলেন, (كَانُوا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرًا اَمْوًا وَّاَوْلَادًا) এরপরও তারা

আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব (দেখ) কেমন ভয়ংকর হয়েছে আমার শাস্তি। (এরা কোন্ হার, এদের তো তেমন সাজসরজামও নেই। বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদই যখন কাজে আসেনি, তখন তারা কোন্ ধোঁকায় পড়ে রয়েছে? তাদের কাছে সাজসরজাম কম বিধায় তাদের অপরাধও গুরুতর। এমতাবস্থায় তারা কেমন করে বাঁচতে পারবে? এ পর্যন্ত নবুয়ত্তের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন কাফিরদেরকে

শাসানোর পর পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে নবুয়ত মেনে নেওয়ার একটি পছা বলে দেওয়া হয়েছে। হে নবী, আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি (ছোট খাট) বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, (তা পালন কর,) তোমরা (কেবল) আল্লাহর উদ্দেশে (বিদ্বৈষম্যুক্ত হয়ে কোন স্থানে) এক-একজন করে এবং (কোন স্থানে) দু' দু'জন করে দাঁড়াও (অর্থাৎ তৎপর হয়ে যাও ; উদ্দেশ্য চিন্তাভাবনা কর। চিন্তাভাবনার নিয়ম রয়েছে যে, কোন কোন সময়ে কোন কোন স্বভাবের দিক দিয়ে দু'জন মিলে চিন্তা করলে প্রত্যেকেই অপরের কাছ থেকে শক্তি পায় এবং কোন কোন সময়ে কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে একাকীত্বে চিন্তাভাবনায় প্রচুর সফলতা আসে। বড় সমাবেশে প্রায়ই চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাই আয়াতে এক-একজন ও দু' দু'জন বলা হয়েছে। মোটকথা, এভাবে তৎপর হয়ে যাও।) অতপর (খুব) অনুধাবন কর। (কোরআনের তুলনা নেই বলে আমি যে দাবি করি, দু'ব্যক্তিই এরূপ দাবি করতে পারে :—(১) যার মস্তিষ্ক ব্রুটিপূর্ণ—পরিণামের খবর রাখে না এবং (২) যেনবী এবং এ দাবির সত্যতায় পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল। নবী না হয়ে বুদ্ধিমান হলেও এরূপ দাবি করার সময় পরিণামে লাঞ্চিত হওয়ার আশংকা করবে যে, যদি কেউ এর বিকল্প তৈরি করে নিলে আসে, তবে কি অবস্থা হবে। এরপর আমার সমষ্টিগত অবস্থা বিবেচনা করে চিন্তা কর যে, আমি বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ কি না। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে জানা যাবে,) তোমাদের সংগীর মধ্যে (যে সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকে এবং যার প্রতিটি অবস্থা তোমরা প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আমার মধ্যে) কোন উন্মাদনা নেই। (অতএব আমি যে নবী, এটাই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।) তিনি (তোমাদের সঙ্গী পয়গম্বর। এ কারণে) তোমাদেরকে এক কঠোর আযাব আসার পূর্বে সতর্ক করেন। (সুতরাং এ পছায় নবুয়ত মেনে নেওয়া খুবই সহজ।

অন্যান্যও প্রায় এর অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন : $\text{أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ}$

কাফিররা আরও সন্দেহ করত যে, ইনি রসূল নন, বরং নেতৃত্বের অভিলাষী। অতপর এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে :) আপনি আরও বলুন, আমি তোমাদের কাছে (প্রচারকার্যের) কোন পারিশ্রমিক চাইলে তা তোমরাই রাখ। (বাকপদ্ধতিতে পারিশ্রমিক চাই না, অর্থে এরূপ বলা হয়।) আমার পুরস্কার তো কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনি যাবতীয় বিষয়ের খবর রাখেন। (সুতরাং তিনি নিজেই আমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে দেবেন। পুরস্কারের মধ্যে ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা এগুলোর মধ্যেও পুরস্কার হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের কাছে কোন স্বার্থ কামনা করি না যে, নেতৃত্বের সন্দেহ করবে। এখন আমি যে মানুষের আচার-আচরণ ও অবস্থার সংশোধন করি, অপরাধীকে শাস্তি দেই এবং পারস্পরিক কলহ-বিবাদ মীমাংসা করি, বস্তুত এসব কারণে সন্দেহ করা যায় না। কারণ, এতে আমার কোন স্বার্থ নেই। সেমতে রসূলুল্লাহ (স)-র

জীবনপদ্ধতি ও আর্থিক অবস্থা দৃষ্টে একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি এসব দায়িত্ব পালন করে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করেন নি। বরং এতে স্বয়ং জাতিরই উপকার ছিল। তাদের জান-মাল ও ইয়্যাত-আবরু নিরাপদ থাকত। পিতা তার শিশু সন্তানের হিফায়ত ও শিক্ষাদান শুধুমাত্র ওভেচ্ছার বশবর্তী হয়েই করেন, স্বার্থসিদ্ধি ও নেতৃত্ব কামনার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। নবুয়্যত প্রমাণিত হওয়ার পর বলা হয়েছে : হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য বিষয়কে (অর্থাৎ ঈমান ও ঈমানী বিষয়সমূহের প্রমাণকে মিথ্যা অর্থাৎ কুফর ও ঈমানী বিষয়সমূহের অস্বীকৃতির উপর বিতর্কের মাধ্যমেও) বিজয়ী করেছেন (যেমন, এই মাত্র যুক্তিতর্ক ও কথোপকথনের মাধ্যমে করা হল এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মাধ্যমেও বিজয়ের ব্যবস্থা হবে। মোটকথা সত্য সর্বতোভাবে প্রবল এবং) তিনি গায়েব বিষয়ে জানী। তিনি পূর্বেই জানতেন যে, সত্য বিজয়ী হবে। অন্যরা তো এখন জানতে পেরেছে। অনুরূপভাবে তিনি জানেন যে, ভবিষ্যতে আরও বিজয়ী হবে। সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) পরবর্তী আয়াতখানি পাঠ করেছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, তরবারির মাধ্যমে বিজয়ও এই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। অতপর এ বিষয়টি আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে, হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি বলুন, সত্য (ধর্ম) আগমন করেছে এবং মিথ্যা (ধর্ম) কিছু করার ধরার ক্ষমতা হারিয়েছে। [অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, মিথ্যাপন্থীরা কখনও জাঁকজমক অর্জন করবে না ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, এই সত্য ধর্ম আগমনের পূর্বে যেমন কোন কোন সময় মিথ্যাকেই সত্য বলে সন্দেহ হত এখন তা আর হবে না। এদিক দিয়ে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশমান হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ প্রকাশমানই থাকবে। অতপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, সত্য ফুটে ওঠার পর এর অনুসরণেই মুক্তি নিহিত। হে মুহাম্মদ (সা),] আপনি (আরও) বলুন, (যখন প্রমাণিত হল যে, এ ধর্ম সত্য, তখন এ বিষয়টি অবশ্যস্বাভাবী হয়ে গেছে যে,) যদি আমি (ধরে নেওয়ার পর্যায়ে সত্যকে পরিত্যাগ করে) পথভ্রষ্ট হয়ে যাই, তবে আমার পথভ্রষ্টতা আমারই শাস্তির কারণ হবে (এতে অপনের কোন ক্ষতি হবে না)। আর যদি আমি (সত্য অনুসরণ করে সত্য পথ প্রাপ্ত হই, তবে তা এই কোরআন ও ধর্মের কারণে, যা আমার পালনকর্তা আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন। আসল উদ্দেশ্য অপরকে শোনানো যে, সত্য ফুটে ওঠার পরও তোমরা তার অনুসারী না হলে তোমরাই শাস্তি ভোগ করবে ; আমার কিছু হবে না। আর যদি সত্য পথে আস, তবে তা এই সত্য ধর্ম অনুসরণের কারণেই হবে। কাজেই সত্য পথ পাওয়ার জন্য এই ধর্ম অবলম্বন করাই তোমাদের কর্তব্য। কারণ পথভ্রষ্ট হওয়া অথবা সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া নিষ্ফল হবে না। কাজেই নিশ্চিত থাকার অবকাশ নেই।) আল্লাহ্ সবার অবস্থা জানেন। (কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সন্নিকটবর্তী (প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)।

জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

عَشْرَ مَعَشَارَ وَمَا بَلَغُوا مَعَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ—কারও মতে

অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। কারও মতে عَشْرَ الْعَشْرِ অর্থাৎ একশ' ভাগের এক ভাগ এবং কারও মতে عَشْرَ الْعَشِيرِ অর্থাৎ এক হাজার ভাগের এক ভাগ। বলা বাহুল্য, শব্দটিতে عَشْرَ এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতকে পাখিব ধনৈশ্বর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে পতিত হয়েছিল এবং সেই আযাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধনৈশ্বর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

এতে মক্কা-
মক্কার কাফিরদের প্রতি দাওয়াত : اٰتَمَّا اَعْظَمَكُمْ بِوَا حِدَّةٍ

বাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশে সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর—আল্লাহর উদ্দেশে দু-দু'জন ও এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও। এখানে “আল্লাহর উদ্দেশে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোন কাজের জন্য তৎপর হওয়া। এখানে اللهُ (আল্লাহর উদ্দেশে) শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, একান্তভাবে আল্লাহকে সম্বলিত করার জন্য বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যানুবেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দু' দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তাভাবনা করা যায়, এক. একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করা এবং দুই. বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শ-ক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমত যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন কর।

اَنْ تَقْوَمُوا اَوْ تَتَفَكَّرُوا—এটা

লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশে মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য না মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই কর অথবা অন্যায়ের সাথে পরামর্শক্রমেই কর।

অতপর এই চিন্তাভাবনার একটি সুস্পষ্ট পছা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগ যুগ ব্যাপী বন্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে যাতে তারা একমতও বটে কোন ঘোষণা দেয়, তবে তা দু'উপায়েরই সম্ভব। এক. হয় ঘোষণাকারী বন্ধপাগল ও উন্মাদ হবে। ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে। দুই. তাঁর ঘোষণা অমোঘ সত্য। কারণ, তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল। তাই আল্লাহ্ আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না যে, মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা ও গোটা কুরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাভীর্য ও শালীনতার পরিপন্থী পায়নি। কেবল এক কলেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী **وَمَا بِمَا حَبَّكُمُ الْخ** বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে।

وَمَا حَبَّكُمُ (তোমাদের সঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয়

মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহ্র নির্ভীক রসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে : **أَنْ هُوَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ** — অর্থাৎ তিনি তো

কেবল কিয়ামতের উয়াবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। **أَنْ رَبِّي يَقْذِفُ**

بِالْحَقِّ عَلَامَ الْغُيُوبِ অর্থাৎ আমার আলিমুল-গায়েব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার

উপর ছুড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন: **قَذِفَ فَازًا هُورًا هِنًا** শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হল মিথ্যার মুকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি **قَذِفَ** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে: **وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ** অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমন পষু'দস্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ؕ وَإِنَّا لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ۝

(৫১) যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, অতপর পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে। (৫২) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এত দূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে? (৫৩) অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে যেমন, তাদের সতীর্থদের সাথেও এলাপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)], যদি আপনি সে সময়াটি দেখতেন, (তবে বিস্ময় বোধ করতেন,) যখন কাফিররা (কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে) ভীত-বিহ্বল হয়ে ফিরবে, অতপর পালানোরও উপায় থাকবে না এবং নিকটবর্তী জায়গা থেকে (তৎক্ষণাৎ)

ধরা পড়বে! (তখন) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম (এবং এতে বণিত যাবতীয় বিষয় মেনে নিলাম। কাজেই আমাদের তওবা কবুল করুন পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে অথবা না পাঠিয়েই।) কিন্তু এত দূরবর্তী জায়গা থেকে তারা তার (অর্থাৎ ঈমানের) নাগাল পাবে কেমন করে? (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের জায়গা ছিল দুনিয়া, যা এখন অনেক দূরে অবস্থিত। এখন পরজগৎ, যা কর্ম জগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ। এখানে ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এখানকার বিশ্বাস অদৃশ্যে বিশ্বাস নয় বরং দেখে বিশ্বাস। দেখার পর কোন কিছু মেনে নেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে আদেশ পালনের কোন দিকই নেই।) অথচ পূর্ব থেকে (দুনিয়াতে) তারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তাদের সে অস্বীকারের সঠিক কোন উদ্দেশ্যও ছিল না, (বরং) বহু দূর থেকে যাচাইহীন উক্তি করত। (দূরের অর্থ সত্যাসত্য যাচাই থেকে দূরে ছিল। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো কুফর করত, এখন ঈমানের সম্মান পেয়েছে এবং তা কবুল হওয়ার বাসনা চেপেছে।) আর (যেহেতু পরকাল কর্মজগৎ নয়, তাই) তাদের ও তাদের (ঈমান কবুল হওয়ার) বাসনার মধ্যে অন্তরাল করে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তাদের বাসনা পূর্ণ হবে না)। যেমন, তাদের সতীর্থদের সাথেও এমনি আচরণ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে (কুফর করে) ছিল। তারা সবাই ছিল বিপ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।

وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ - অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এটা হাশর

দিবসের অবস্থা। তখন কাফির ও পাপাচারীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিগ্রাণ পাবে না। দুনিয়াতে কোন অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্ব-স্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কণ্ঠ ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; বরং স্ব-স্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

تَنَاوَسُوا—وَقَالُوا أَمْثَلُهَا وَأَنَا لِيَوْمِ النَّارِ وَمِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

অর্থ হাত বাড়িয়ে কোন কিছু উঠানো। বলা বাহুল্য, যে বস্তু বেশী দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে উঠানো যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কোরআনের প্রতি অথবা রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পাখিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকালে কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

قَدْ كَفَرُوا بِنَبِيِّهِمْ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَنْقُذُ فَوْقَ الْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

অর্থ কোন বস্তু নিষ্কেপ করা। আরবী বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে **قَدْ كَفَرُوا بِهِ** অথবা **قَدْ كَفَرُوا بِالْغَيْبِ** বলে ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ সে অন্ধকারে তীর চালান, যার কোন লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে **مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ**—এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে—মনে তার বিশ্বাস রাখে না।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ—অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রিয় ও

উদ্দিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কিয়ামতে তারা মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পাখিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরাল হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

شَيْعَةً أَمْثِلُهَا كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاءِهِمْ—এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী

ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের অতীত ও ঈপ্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স)-র রিসালত এবং কোরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না।

সূরা ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْمَعَةِ

تَشْتَأِ وَيُثَلِّثُ وَيُرْبِعُ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ

فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مَنْ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا هُوَ ذَا قُوَّةٍ تَوْفُكُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক—তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম। (২) আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায ফিরে যাচ্ছ?

তফসীরের সার সংক্ষেপ

সমস্ত প্রশংসা (ও সাধুবাদ) আল্লাহর জন্য শোভনীয়, যিনি আসমান ও জমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন—যারা দুই দুই, তিন তিন

ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। (বার্তার অর্থ পয়গম্বরগণের কাছে ওহী পৌঁছানো—
বিধানাবলী সম্পর্কিত ওহী হোক অথবা কেবল সুসংবাদ ইত্যাদি হোক। পাখার
সংখ্যা চার চারের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং) তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ
করেন। (এমন কি কোন কোন ফেরেশতার ছয় শ' পাখা সৃষ্টি করেছেন। যেমন,
হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে।) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা
সর্ববিষয়ে সক্ষম। (এমন সক্ষম যে, তাঁর কোন প্রতিবন্ধক নেই।) আল্লাহ মানু-
ষের জন্য যে অনুগ্রহ খুলে দেন (যেমন, বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও সাধারণ রুহী), তার
বারণকারী কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তার (বারণ করার) পরে তা কেউ
জারী করতে পারে না। তবে তিনি বন্ধ ও মুক্ত সবকিছু করতে পারেন। তিনি
পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সক্ষম) প্রজাময়। (অর্থাৎ বন্ধ ও মুক্ত করণে প্রজ্ঞাসহকারে
করেন।) হে মানুষ, (যেমন আল্লাহর ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তেমনি তাঁর নিয়ামতও
পরিপূর্ণ, অগণিত, তাই) তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর (এবং
শোকর আদায় কর। অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর ও শিরক পরিত্যাগ কর। অন্তত
তার দুটি নিয়ামত সম্পর্কে চিন্তা কর যেগুলো সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিতে ও কায়ম
রাখতে সহায়তা করে।) আল্লাহ ব্যতীত কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে
আসমান ও জমীন থেকে রিষিক দান করবে? (অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কেউ সৃষ্টিও
করতে পারে না এবং সৃষ্টির পর তাকে কায়ম রাখার জন্য রুহীও দিতে পারে না।
এতে জানা গেল যে, তিনি সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং নিশ্চিতই) তিনি ব্যতীত
কোন উপাস্য নেই। কাজেই তোমরা (শিরক করে) কোথায় উল্টোদিকে যাচ্ছ ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جَا عَلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا — ফেরেশতাগণকে রসূল অর্থাৎ বার্তাবাহক করার

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহর দূত নিযুক্ত করে পয়গম্বরগণের কাছে পাঠানো
হয়। তারা আল্লাহর ওহী ও হুকুম আহকাম পৌঁছে দেয়। রসূল অর্থ এখানে
মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে
মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে পয়গম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ তা'আলার
মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহর রহমত
অথবা আযাব পৌঁছানোর কাজেও ফেরেশতারা মাধ্যম হয়ে থাকে।

أُولَىٰ أَوْلَىٰ أَجْنَحَةً مِّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা-

গণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যশ্দ্দারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ

সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ছয়শ পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর)

আয়াতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার বার্তা বহন করে দুনিয়াতে পৌঁছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিন তিন এবং কখনও চার চার করে আগমন করে। এমতাবস্থায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বোঝায় না; বরং একটা উদাহরণ মাত্র। কেননা, কোরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও বেশীসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে।—(বাহরে মুহীত)

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে

যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যত এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের পাখা দু'চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ্ ইচ্ছা কল্পলে তা আরও অনেক বেশীও হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবু হাইয়ান বাহরে মুহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ্ তা'আলার দান ও নিয়ামত। এজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا - এখানে রহমত বলে

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেমন---ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিযিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ, ইয়মত-আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য স্বীয় অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেঁকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কণ্ঠ দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কারণবশত কোন বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।—(আবু হাইয়ান)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। একবার হযরত মোয়্যা-বিন্না (রা) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তুমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে শুনেছ, এরূপ কোন হাদীস আমাকে লিখে পাঠাও। হযরত মুগীরা তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায আদায়ের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি : **اللَّهُمَّ لِمَا مَنَعَنَا لِمَا** অর্থাৎ হে আল্লাহ্, যে বস্তু আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকেতে পারে না এবং আপনি যা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোন চেষ্টা কার্যকর হতে পারে না।—(মসনাদে আহমদ)

মুসলিমে বর্ণিত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-র রেওয়াজেতে আছে যে, উপরোক্ত বাক্য-গুলো তিনি রুকু থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন : **أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكَلَّمْنَا لَكَ** অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলে মাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় : উল্লিখিত আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। এর মাধ্যমেই মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। —(রাহুল-মা'আনী)

হযরত আমের ইবনে আবদে কান্নেস (রা) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কোর-আন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে

বিষয়ে আমার কোন চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই : **مَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ** **لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ لَهَا مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا** দ্বিতীয়

আয়াত এরই সমর্থবোধক :

أَنْ يُمْسِكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
وَمَا مِنْ - آيَاتٍ - عَشْرٍ يَسْرُ এবং চতুর্থ আয়াত

—(রাহুল-মা'আনী) **دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا**

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন : **مَطَرْنَا بِنُوءِ الْفَتْحِ**
 অতপর **مَا يَفْتَحُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ** আয়াত পাঠ করতেন। এতে আরবদের ভ্রান্ত
 ধারণার খণ্ডন হয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে
 বলত, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবু হোরায়রা বলেন,
 আমরা **مَا يَفْتَحُ اللَّهُ** আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তিনি বৃষ্টির সময় এই
 আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন।—(মুয়াত্তা মালেক)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ

الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ

عَدُوًّا وَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝ الَّذِينَ

كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ

اللَّهُ يُضِلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۝ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ

عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

(৪) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বর-
 গণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আল্লাহ্র প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়।
 (৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমা-
 দেরকে কিছুতেই ধোঁকা না দেয় এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন আল্লাহ্র নামে তোমা-
 দেরকে প্রতারণা না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রুরূপে
 গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। (৭) যারা
 কুফর করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম
 করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে
 দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে।
 নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথদ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে পয়গম্বর (সা)], তারা যদি আপনাকে (তওহীদ, রিসালত প্রভৃতি ব্যাপারে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে (আপনি সেজন্য দুঃখিত হবেন না। কেননা) আপনার পূর্বেও বহু পয়গম্বরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। (এক সান্নত্বনা তো এই, দ্বিতীয় এই যে,) আল্লাহর দিকেই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। (তিনি নিজেই সব বুঝে নেবেন। আপনি চিন্তা করবেন কেন! অতপর সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে,) হে মানুষ। **إِلَى اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ** (বাক্যে কিয়ামতের খবর শুনে

বিস্ময়বোধ করো না।) আল্লাহ তা'আলার (এ) ওয়াদা সত্য। সুতরাং পৃথিবী জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। (এতে মগ্ন হয়ে প্রতিশ্রুত সেদিন সম্পর্কে গাফিল হয়ে যেয়ো না) এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণায় না ফেলে। তোমরা তার এই প্ররোচনায় বিশ্বাস করো না যে, আল্লাহ আযাব দেবেন না; যেমন সে বলত, **وَلَيْتَن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنْ لِيٰ عِنْدَ اللَّهِ لِحُسْنَىٰ** এবং

শয়তান (যার কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে) নিশ্চিতই তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুই মনে কর। সে তার দলবলকে (অর্থাৎ অনুসারীদেরকে মিথ্যার প্রতি শুধু এ কারণেই) আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়ে যায়। (সুতরাং) যারা কাফির হয়ে গেছে (এবং শয়তানের প্রতারণায় ফেঁসে গেছে) তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে (এবং শয়তানের জালে আবদ্ধ হয় না) তাদের জন্য রয়েছে (গোনাহ থেকে) ক্ষমা এবং (সৎকর্মের কারণে) মহা পুরস্কার। (অতএব এমন দু'জন কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ) যাকে তার মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতপর সে তাকে উত্তম মনে করে এবং যে ব্যক্তি মন্দকে মন্দ মনে করে, তারা কি সমান হতে পারে? (প্রথমোক্ত ব্যক্তি কাফির, যে শয়তানের প্ররোচনায় সত্যকে মিথ্যা এবং ক্ষতিকরকে উপকারী মনে করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মু'মিন, যে পয়গম্বরগণের অনুসরণ এবং শয়তানের বিরোধিতার কারণে সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা, ক্ষতিকরকে ক্ষতিকর এবং উপকারীকে উপকারী মনে করে। অর্থাৎ উভয়ে সমান হতে পারে না; বরং একজন জাহান্নামী, অপরজন জান্নাতী। সুতরাং তাদের মধ্যে তফাৎ আছে। যদি অর্থাৎ হও যে, বুদ্ধিমান মানুষ অসৎকে সৎ কিরূপে মনে করতে পারে, তবে এর কারণ এই যে,) আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন (তার জ্ঞানবুদ্ধি পাল্টে যায়) এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। (ফলে তার উপলব্ধি ঠিক থাকে। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই যখন এমন হয়,

তখন) আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। (অর্থাৎ মোটেই আক্ষেপ করবেন না--সবর করে বসে থাকুন) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজকর্ম জানেন। (সময় এলে বুঝে নেবেন।)

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

غُرُورٌ لَا يَغُرُّنَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ অতি

প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়'—এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না।
—(কুরতুবী)

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ইমাম বগভী হযরত ইবনে

আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) দোয়া করেছিলেন : হে আল্লাহ্ উমর ইবনে খাতাব অথবা আবু জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ্ তা'আলা উমর ইবনে খাতাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবু জাহল তার পথপ্রস্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(মাযহারী)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنِّيْرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيْمِيْنٍ

فَأَخْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَلِكَ النُّشُوْرُ ۗ مَن كَانَ يُرِيْدُ

الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۗ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَالَّذِيْنَ يَنْكُرُوْنَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ

وَمَكْرُؤُوكَ هُوَ ۗ يَبُوْرُ ۗ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ

ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ

وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ

عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذَابٌ فَرَاتٌ سَابِغٌ
 شَرَابُهُ هُوَ هَذَا مِلْحٌ أُجَابٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحَمَاهُ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
 حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَىٰ الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يُؤَلِّجُ الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي الْبَيْلِ
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذُكِرْتُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ
 قِطْمِيرٍ ۚ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ
 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

(৯) আল্লাহ্‌ই বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতপর তন্দ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনভাবে হবে পুনরুত্থান। (১০) কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুক সমস্ত সম্মান আল্লাহ্রই জন্য। তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতপর বাঁধ থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না; কিন্তু তাঁর জাত-সারে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। (১২) দু'টি সমুদ্র সমান হয় না—একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরাটি লোন। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। ইনি আল্লাহ্‌; তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের

সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহ্‌র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ (এমন সক্ষম যে, তিনিই বৃষ্টির পূর্বে) বায়ু প্রেরণ করেন, অতপর বায়ু মেঘমালাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। (সূরা রুমে এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে)। অতপর আমি মেঘমালাকে গুরু ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি (ফলে সেখানে বৃষ্টিপাত হয়)। অতপর আমি তন্দ্বারা (অর্থাৎ বৃষ্টির পানি দ্বারা) ভূ-খণ্ডকে (উদ্ভিদ দ্বারা) সঞ্জীবিত করি। (ভূ-খণ্ডকে যেমন তার উপযুক্ত জীবন দান করি) তেমনি-ভাবে (কিয়ামতে মানুষের) পুনরুত্থান হবে। (অর্থাৎ তাদের উপযুক্ত জীবন তাদেরকে দান করা হবে। এখানে তুলনার অভিন্ন বিষয় হচ্ছে, উভয়ের মধ্যে একটি লয়প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য ফিরিয়ে আনা। ভূ-খণ্ডের মধ্যে উদ্ভিদের রুমবিকাশ ফিরিয়ে আনা হয়, আর মানব দেহে ফিরিয়ে আনা হয় আত্মা। তওহীদের প্রমাণ প্রসঙ্গে হাশর ও নশরের এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এই পুনরুত্থানের সাথে সপ্ততিসম্পন্ন আরেকটি বিষয় এই যে, কিয়ামতে যখন জীবিত হতে হবে, তখন সেখানকার লালছনা ও অবমাননা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মুশরিকরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে স্বহস্ত নিমিত্ত মুক্তিকে সম্মান লাভের উপায় স্থির করে রেখেছিল। তারা

বলত, ^{اَوْ لِيَا شَفَعَاءِ نَا عِنْدَ اللّٰهِ} ^{هَلْ لَّآءِ شَفَعَاءِ نَا عِنْدَ اللّٰهِ}— অর্থাৎ এরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের

সুপারিশকারী—জাগতিক প্রয়োজনেও এবং কিয়ামতে কিছু হলে পরকালীন মুক্তির

জন্যেও। সূরা মরিয়ম্‌তে আল্লাহ্ বলেন, ^{وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا}

^{لَهُمْ عِزًّا}— এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে।) যে ব্যক্তি (পরকালে) সম্মান কামনা করে

(পরকাল নিশ্চিত বিধায় এমন কামনা করা আবশ্যিকও বটে—তার উচিত আল্লাহ্‌র কাছে সম্মান প্রার্থনা করা। কেননা) সমস্ত সম্মান (সত্তাগতভাবে) আল্লাহ্‌রই।

(অন্যদের সম্মান অসত্তাগতভাবে হয়ে থাকে। অসত্তাগত বিষয় সর্বদা সত্তাগত বিষয়ের মুখাপেক্ষী হয়। সুতরাং সম্মানের ব্যাপারে সবাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী।

বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সম্মান লাভের পছা হল কথায় ও কাজে তাঁর আনুগত্য করা। আল্লাহ্ তাই পছন্দ করেন। সেমতে) সৎবাক্য তাঁর কাছে পৌঁছে (অর্থাৎ

তিনি তা কবুল করেন) এবং সৎকর্ম তাকে পৌঁছায়। (সৎবাক্য বলে কলেমায়ে

তওহীদ ও আল্লাহ্‌র যিকির-আযকার এবং সৎকর্ম বলে আন্তরিক বিশ্বাস এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় সাধুকর্মকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, কলেমায়ে তওহীদ ও যিকির-আযকারকে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় করার উপায় হচ্ছে

সৎকর্ম। এখানে মূলত গ্রহণীয় হওয়া ও পূর্ণরূপে গ্রহণীয় হওয়া উভয়টি বোঝানো হয়েছে। সেমতে যাবতীয় সৎবাক্য গ্রহণীয় হওয়ার জন্য মূলত আন্তরিক বিশ্বাস ও ঈমান অপরিহার্য শর্ত ; এছাড়া কোন যিকির গ্রহণীয় নয়। পক্ষান্তরে সৎবাক্য পূর্ণরূপে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য অন্যান্য সৎকর্ম শর্ত ; সাধারণভাবে হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কেননা ফাসিক ব্যক্তি সৎবাক্য বললে তাও গ্রহণীয় হয় ; কিন্তু পূর্ণরূপে গ্রহণীয় হয় না। সুতরাং এগুলো যখন আল্লাহর পছন্দনীয়, তখন যে ব্যক্তি এগুলো অবলম্বন করবে, সে সম্মান লাভ করবে।) আর যারা (এর বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে আপনার বিরোধিতা করছে, যা আল্লাহ তা'আলারই বিরোধিতা এবং আপনার বিরুদ্ধে) মন্দ-কার্যের চক্রান্তে লেগে আছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (এ শাস্তি তাদের লাঞ্ছনার কারণ হবে। তাদের স্বনির্মিত মূর্তি তাদেরকে মোটেই সম্মান দিতে পারবে না। বরং উল্টো তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মরিয়ম্‌তে বলেন,

عِبَادٌ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

এটা হবে তাদের পরকালের ক্ষতি। দুনিয়ার ক্ষতি এই হবে যে, তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। (অর্থাৎ তারা এতে সফল হবে না! বস্তুত তাই হয়েছে। তারা ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু নিজেরাই মিটে গেছে। এটা ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতপর আবার তওহীদের বিষয় বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, একতো

اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ

আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। তওহীদ জ্ঞাপনকারী দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (অর্থাৎ তোমাদের মূল আদমকে) সৃষ্টিকারী থেকে, অতপর (পুরোপুরিভাবে) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদেরকে যুগল (অর্থাৎ কিছু পুরুষ ও কিছু স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। (এ হচ্ছে তাঁর কুদরত। এখন জ্ঞান দেখ—) কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসব করে না ; কিন্তু সবই তাঁর জ্ঞাতসারে হয়। (অর্থাৎ তিনি পূর্ব থেকে সব জ্ঞাত থাকেন। অনুরূপভাবে) কারও বয়স বেশি (নির্ধারণ) করা হয় না এবং কারও বয়স কম (নির্ধারণ) করা হয় না, কিন্তু সবই লওহে মাহফুযে লিখিত থাকে। (আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদি জ্ঞান অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এজন্য আশ্চর্যবোধ করো না যে, সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সব ঘটনা কিরূপে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হল? কেননা) এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (কারণ, তাঁর সত্তাগত জ্ঞানের আওতায় অতীত ও ভবিষ্যত যাবতীয় ঘটনা একইরূপে বিদ্যমান রয়েছে। অতপর কুদরতের আরও দলীল শোন : পানি একই উপাদান সত্ত্বেও তাতে বিভিন্ন দু'টি প্রকার সৃষ্টি করা হয়েছে।) দু'টি সমুদ্র সমান নয় ; (বরং) একটি মিঠা তৃষ্ণা নিবারক, (হাদয়গ্রাহী হওয়ার কারণে) সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর। (এটিও কুদরতের অভিনব বস্তু। আরও কতক দলীল কুদরত জ্ঞাপনকারী হওয়ার সাথে সাথে নিয়ামতও জ্ঞাপন করে। উদাহরণত

তোমরা প্রত্যেক দরিয়া থেকে (মৎস্য শিকার করে, তার) তাজা গোশত আহার কর এবং গয়না (অর্থাৎ মোতি) বের কর, যা তোমরা পরিধান কর। (হে সম্মোখিত ব্যক্তি,) তুমি দেখ যে, জাহাজগুলো পানির বুকে চিরে তাতে চলাফেরা করে, যাতে তোমরা (এদের সাহায্যে সফর করে) আল্লাহর রিযিক অন্বেষণ কর এবং (রিযিক অন্বেষণ করে আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (এছাড়া আরও বহু নিয়ামত রয়েছে। যেমন,) তিনি রাত্রিকে (অর্থাৎ তার অংশকে) দিবসের মাঝে (অর্থাৎ তার অংশের মাঝে) ঢুকিয়ে দেন এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে ঢোকান। (এতে দিব্যরাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত উপকারিতা অর্জিত হয়। আরও নিয়ামত এই যে,) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (কিয়ামত) পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই আল্লাহ (যার এই অবস্থা) তোমাদের পালনকর্তা। সাম্রাজ্য তারই তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটি পরিমাণ ক্ষমতাও রাখে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। যেসব উপাস্য প্রাণী তারাও সরু নরি ও সন্তাগতভাবে ক্ষমতার অধিকারী নয়। তাদের অবস্থা এই যে,) তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে (একেতো) তারা শোনে না। (জড় উপাস্যদের মধ্যে শোনার যোগ্যতাই নেই। প্রাণীরা মারা গেলে তাদের শ্রবণ জরুরী ও স্থায়ী নয়—আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুনিবে দেন, ইচ্ছা না করলে শোনান না।) যদি শুনেও নেয়, তবে তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে।

(যেমন, এক আয়াতে আছে—^{وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى} مَا كَانُوا آيَاتًا نَّاعْبُدُ وَنَ—^{وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى} আমি যা বলেছি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা আমি সত্যাসত্যের পূর্ণ খবর রাখি। অতএব) খবরদার আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। (সূতরাং আমার বক্তব্য সর্বাধিক নির্ভুল)।

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

الْبَيْتِ يُعَدُّ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحَ يَرْفَعُهُ

হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাথে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সন্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সৎকর্ম। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরীয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ আবদুল কাদির (র) 'মুযেহল কোরআনে' বলেন, সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপন সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর

যিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নিদিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই যিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে : সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌছায়। **العمل الصالح يرفع**
 বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, মাহহাক শহর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তওহীদ হোক অথবা অন্য কোন যিকির-তসবীহই হোক—কোনটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কিংবা অন্য কোন যিকির মকবুল নয়।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মকরুহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তওহীদ উচ্চারণ করুক—আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার যিকির ও কালেমায়ে তওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না—(কুরতুবী)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মুত্তাবিক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

কোন কোন তফসীরকার উপরোক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণ এই বলেছেন যে, **عمل صالح** হচ্ছে **صهبر مفعول** এবং **كلم طيب** হচ্ছে **صهبر فاعل** শব্দের **يرفع**

অতএব অর্থ এই যে, সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায়। অর্থাৎ কবুল-যোগ্য করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সারমর্ম এই হবে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকিরও করে, তার এই যিকির তার কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবুলযোগ্য করে তোলে।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত মথেলত নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজাসমূহ মেনে চলাও যিকির ব্যতীত ফুটে উঠে না; প্রচুর যিকিরই সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

অধিকাংশ — وَمَا يَعْمُرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَمْرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ

তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানব-জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্‌হাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া যায়। তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়সক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তফসীর শা'বী, ইবনে জুবায়র, আবু মালিক, ইবনে আতিয়া ও সুদী থেকে বর্ণিত আছে। —(রাহুল মা'আনী) এ বিষয়বস্তুটি নিশ্চিন্ত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে :

حَيَاتِكَ أَنْفَاسٌ تَعُدُّ فِكْلِمًا - مَعْنَى نَقَسَ مِنْهَا أَنْ تَنْقُصَتْ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুণতি কয়েকটি নিঃশ্বাসের নাম। কাজেই যখনই একটি শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসাই বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালিকের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ سَرَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ "যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে,

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই :

: ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ামাতে হযরত আবুদ্দারদা (রা) বজেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বজেন, (বয়স তো আল্লাহ তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সংকমপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় ফায়দা লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ামাতে বর্ণনা করেছেন।) সারকথা, যে সব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

—وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَعْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا

অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত অর্থাৎ মৎস্য খাওয়ার জন্য পাও। আয়াতে মৎস্যকে গোশত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশত—একে যবেহ করার প্রয়োজন হয় না। স্থল-ভাগের অন্যান্য জন্তু এর বিপরীত। সেগুলো যবেহ না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশত। শব্দের অর্থ গয়না। এখানে মোতি বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায়। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত মত এই যে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কোরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়।

تَلْبَسُونَهَا শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যবহার করা পুরুষদের জন্যও জায়েয। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকাররূপে ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জায়েয নয়।—(রাহুল মা'আনী)

—أَنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; বিপদ মুহূর্তে